بسم الله الرحمن الرحيم

وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ

রহমতে আলম

[সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম]

লেখক
মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান

প্রকাশনায়

আন্‌জুমান-এ-রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট

[প্রচার ও প্রকাশনা বিভাগ]

৩২১, দিদার মার্কেট (৩য় তলা দেওয়ান বাজার, চট্টগ্রাম-৪০০০, বাংলাদেশ। ফোন : ০৩১-২৮৫৫৯৭৬,
E-mail:anjumantrust@yahoo.com, anjumantust@gmail.com
www.anjumantrust.org

রহমতে আলম

[সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম]

লেখক
মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান

প্রকাশকাল
১২ রবিউল আউয়াল শরীফ, ১৪৩৮ হিজরী
২৯ অগ্রহায়ণ, ১৪২৩ বাংলা
১৩ ডিসেম্বর, ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ

প্রস্তুতকরণে
আনজুমান রিসার্চ সেন্টার
আলমগীর খানক্বাহ্ শরীফ
ষোলশহর, চট্টগ্রাম।

সর্বস্বত্ত্ব প্রকাশকের

হাদিয়াঃ ২৫/- টাকা মাত্র

RAHMATE AALAM (SALLALLAHU TA'ALA ALAIHI WASALLAM), WRITTEN BY **MOULANA MUHAMMAD ABDUL MANNAN**, PUBLISHED BY **ANJUMAN-E RAHMANIA AHMADIA SUNNIA TRUST.** CHITTAGONG, BANGLADESH. **HADIAH TK. 25**/- ONLY.

সূচীপত্র

	বিষয়	পৃষ্ঠা
❖	পেশ কালাম (মুখবন্ধ)	০৪
❖	আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে রসূলে করীমের নৈকট্য	০৬
❖	রাহমাতুল্লিল আলামীন হওয়ার জন্য কি কি প্রয়োজন	০৭
❖	রউফ, রহীম ও রহমত	০৮
❖	হুযূর-ই আক্রাম কখন থেকে রহমত	১০
❖	হুযূর-ই আক্রাম কার জন্য রহমত	১০
❖	হুযূর-ই আক্রাম কী পরিণাম রহমত	১১
❖	সমগ্র বিশ্ব হুযূর-ই আক্রামের মুখাপেক্ষী	১১
❖	হুযূর-ই আক্রাম সমস্ত নবীর জন্য রহমত	১১
❖	হযরত জিবরাঈল আলায়হিস্ সালামের জন্য রহমত	১২
❖	মু'মিনদের জন্য রহমত	১২
❖	কাফিরদের জন্য রহমত	১৩
❖	গোলামদের জন্য রহমত	১৪
❖	নারী ও শিশুদের প্রতি রহমত	১৬
❖	বৃদ্ধ ও দুর্বলদের প্রতি রহমত	১৬
❖	পশু-প্রাণী ও গাছপালার প্রতি রহমত	১৭
❖	রহমত বা দয়াপ্রদর্শনের শিক্ষাদান	১৭
❖	হুযূর কত দিন পর্যন্ত পর্যন্ত রহমত	১৭
❖	আক্বীদা	১৯
❖	পূর্বাপর সবকিছু সম্পর্কে জ্ঞাত	২০
❖	রহমত ও সর্বোত্তম আদর্শ	২১

মুখবন্ধ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম
নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লী ওয়া নুসাল্লিমু 'আলা রসূলিহিল করীম
ওয়া 'আলা- আ-লিহী ওয়া সাহবিহী আজমা'ঈন

আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর অনেক সৃষ্টিকে তাঁর রহমত বা দয়ার মাধ্যম হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। তন্মধ্যে নবীগণ আলায়হিস্ সালাম আল্লাহ্ তা'আলার বিশেষ রহমত। কোন নবী রসূলকে প্রেরণের পূর্ব পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'আলা পৃথিবীতে কোন জাতি বা গোষ্ঠীর উপর আযাব নাযিল করেন নি। হযরত ঈসা আলায়হিস্ সালামকে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর পক্ষ থেকে 'রহমত' বলে আখ্যায়িত করেছেন। তবে তাঁদের রহমত এত ব্যাপক ছিলোনা, যত ব্যাপকতা আমাদের নবী, আমাদের আক্বা ও মাওলা হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা, আহমদ মুজতাবা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর রহমতের রয়েছে। তিনি তো সমস্ত বিশ্ব ও বিশ্ববাসীর জন্য রহমত। আল্লাহ্ তা'আলা নিজেকে 'রব্বুল আলামীন' (সমস্ত বিশ্বের রব বা প্রতিপালক) বলেছেন, আর তাঁর হাবীবকে বলেছেন 'রাহমাতুল্লিল আলামীন' (সমস্ত বিশ্বের জন্য রহমত)। অর্থাৎ যার জন্য মহান আল্লাহ রব, তার জন্য আল্লাহর হাবীব রহমত। আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র ক্বোরআনে ঘোষণা করেছেন, ''ওয়ামা---'আরসালনা-কা ইল্লা--রাহমাতালিল 'আ-লামী-ন''। (হে হাবীব! আমি তো আপনাকে সমস্ত বিশ্বের জন্য রহমত করেই প্রেরণ করেছি।)

বস্তুত: এ ক্ষুদ্র পুস্তিকায় বিশ্বনবীর রহমতের ব্যাপকতা কতবেশি তা অতি সংক্ষেপে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর হাবীবের প্রশংসায় এ ক্ষুদ্র পুস্তিকা গ্রহণযোগ্য হলে এবং সম্মানিত পাঠক সমাজ এটা দ্বারা উপকৃত হলেই আমাদের প্রচেষ্টা সার্থক হবে। আ-মী-ন।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

রহমতে আলম

[সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম]

বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম যে 'রহমতে আলম' (সমগ্র বিশ্বের জন্য রহমত), তা অকাট্যভাবে প্রমাণিত। কারণ, খোদ্ আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র ক্বোরআনে এরশাদ করেছেন ''ওয়ামা--- আরসালানা-কা ইল্লা-রাহমাতাল্লিল 'আ-লামী-ন।'' [সূরা আম্বিয়া: আয়াত-১০৭]

তরজমা: ''আমি আপনাকে সমস্ত বিশ্বের জন্য রহমত করেই প্রেরণ করেছি।'' রসূলে করীমের বহু বিশুদ্ধ হাদীস শরীফ, ইতিহাস, দ্বীনের নির্ভরযোগ্য কিতাবাদি এবং বাস্তবতা দ্বারাও একথা অকাট্যভাবে প্রমাণিত।

দেখুন, বিশ্বস্রষ্টা হলেন প্রেরণকারী, যাঁকে প্রেরণ করেছেন তিনি হলেন রসূলে আরবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম। আর যার প্রতি প্রেরণ করেছেন তা হলো 'আলামীন।

এ 'আলামীন' শব্দটার প্রতি গভীরভাবে লক্ষ্য করলে বিশ্বনবীর রহমতের ব্যাপকতা সুস্পষ্ট হয়ে যায়। 'আলামীন' (সমস্ত বা সমগ্র বিশ্ব) অতি ব্যাপক শব্দ। যেমন- আলমে নাবাতাত (তৃণজগত), আলমে হায়ওয়ানাত (প্রাণী জগত), আলমে জমাদাতা (জড়জগত), আলমে না-সূত (মানবজগত), আলমে মালাকূত (ফেরেশতাজগত), আলমে তাগূত (দানব জগত) ইত্যাদি। অন্যভাবে বলা যায়- 'এখানকার বিশ্ব, ওখানকার বিশ্ব, পার্থিব বিশ্ব, আসমানী জগত, ইহজগত, পরজগত, প্রাচ্য জগত, পাশ্চাত্য জগত, উত্তর-বিশ্ব, দক্ষিণ-বিশ্ব, যৌবনের দুনিয়া, শৈশবের দুনিয়া, মোটকথা, যত বিশ্ব, দুনিয়া বা জগত থাকুক না কেন, সবই এ 'আলামীন' শব্দের মধ্যে রয়েছে। এ সব জগতকেই এক শব্দে 'আলামীন' বলা হয়। এ 'আলামীন' শব্দের ব্যাপকতা বুঝতে হলে 'আলহামদু লিল্লা-হি রাব্বিল আলামীন' (আল-আয়াত) দ্বারা বুঝার চেষ্টা করা চাই। এ আয়াতের অর্থ হলো- 'সমস্ত প্রশংসা খাস আল্লাহ্ তা'আলার জন্য, যিনি সমগ্র বা সমস্ত বিশ্বের রব' (মহান প্রতিপালক)।

আল্লাহ তা'আলার দরবারে রসূলে করীমের নৈকট্য

মহান রবই প্রেরণ করেছেন। তাঁর রসূলকে প্রেরণ করেছেন। 'আলামীন' বা সমস্ত বিশ্বের জন্য প্রেরণ করেছেন। একথা সর্বজনমান্য যে, যাঁর মালিকানা থাকে তিনিই তো প্রেরণ করেন। যাঁকে প্রেরণ করেন, তাঁকে একান্ত আপন করেই প্রেরণ করেন। এজন্যই এ প্রেরণের পূর্বে রসূলে করীমের প্রতি অতিমাত্রায় গুরুত্ব বর্তানো হয়েছে। রসূলে আক্রাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম নিজেই এরশাদ করেছেন- ''আউয়ালু মা-খালাক্বাল্লা-হু নূরী।'' (সর্বপ্রথম মাখলূক্ব হলো আমার নূর)। ''কুন্তু নাবিয়্যান ওয়া আ-দামু বায়নার রূ-হি ওয়াল জাসাদ।'' (আমি নবী ছিলাম আর হযরত আদম রূহ ও দেহের মান্যিলগুলো অতিক্রম করছিলেন)। ''কুন্তু নাবিয়্যান ওয়া আ-দামু বায়নাল মা-ই ওয়াত্বত্বীন।'' (আমি নবী ছিলাম আর হযরত আদম পানি ও মাটির মান্যিলগুলো অতিক্রম করছিলেন।)

বুঝা গেলো যে, আমাদের রসূলতো তখনই পয়দা হয়েছেন, যখন না যমীন ছিলো, না আসমান ছিলো, না ছিলো উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব ও পশ্চিম, না ছিলো ফরশ, না ছিলো ফরশী, না আগুন ছিলো, না আগুনের জিনিসগুলো ছিলো। এভাবে, না ছিলো বাতাস, না ছিলো বাতাসের জিনিসগুলো। না ছিলো পানি, না ছিলো পানির সৃষ্টিগুলো। তখনো যমীনের ফরশ বিছানো হয়নি, আসমানের শামিয়ানা টাঙ্গানো হয়নি, তখনো চন্দ্র-সূর্যের প্রদীপগুলো জ্বালানো হয়নি, তারকাগুলোর ফানুস তখনো আলোকদীপ্ত করা হয়নি, তখনো পানির কলকল শব্দ জারী করা হয়নি, সমুদ্রে জলরাশির গতিও শুরু হয়নি; তখনো উঁচু উঁচু পাহাড়-পর্ব্বতও অস্তিত্বে আসেনি। কিছুই ছিলো না, কিন্তু ছিলো নূরে মুহাম্মদী (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)।

একথাও প্রতীয়মান হয় যে, প্রেরণকারী (মহান রব) আপন প্রেরিত (রসূল)-কে প্রেরণের পূর্বে নিজের নৈকট্য দ্বারা ধন্য করেছেন এবং অতি নিকটে রেখেছেন। আর এমন সময়ে নৈকট্য দান করেছেন, যখন সৃষ্টিজগতের কোন জিনিসের অস্তিত্বই ছিলোনা। নৈকট্যও কার? মহান বিশ্ব-স্রষ্টার। এ নৈকট্যের ফলে রসূল-ই আক্রাম আল্লাহর গুণাবলী ও আল্লাহ্র পূর্ণতাদির প্রকাশস্থল হয়ে গিয়েছেন। তারপর প্রেরিত হয়ে এসেছেন। সুবহানাল্লাহ। এখন দেখুন-

রাহমাতুল্লিল 'আলামীন' হওয়ার জন্য কি কি প্রয়োজন

যেহেতু রসূল সমগ্র বিশ্বের জন্য রহমত, আর বিশ্বের মধ্যে রয়েছে সব ব্যক্তি, প্রাণী ও বস্তু, যার মধ্যে সৃষ্টির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সবই রয়েছে, যা'তে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সবই শামিল আছে, সেহেতু সবার অনুকূলে রহমত হবার জন্য কিসের প্রয়োজন তাও ভেবে দেখে দরকার।

সবার অনুকূলে দয়া বা দয়ালু হবার জন্য জীবিত হওয়া জরুরী, মওজুদ থাকা জরুরী। প্রতিটি মুহূর্তে রহমত হবার জন্য জরুরী হচ্ছে বিশ্বের সমস্ত সৃষ্টির নিকটে থাকা বা থাকতে পারা। অন্যথায় তিনি সবার জন্য দয়ালু হতে পারবেন না। হাযিরও হওয়া চাই, নাযিরও হওয়া জরুরী (উপস্থিত ও দ্রষ্টা হওয়া অনিবার্য)। দেখতে হবে বিপদগ্রস্ত কোন্ অবস্থায় আছে। আবার দয়া প্রদর্শনের জন্য প্রত্যেক ভাষারও জ্ঞান থাকতে হবে। যদি তিনি সবার ভাষা না জানেন, তাহলে সবার জন্য দয়াবানও হতে পারবেন না। সুতরাং বুঝা গেলো যে, মেহেরবান (দয়ালু) হবার জন্য 'আলিম' (জ্ঞানবান) হওয়াও জরুরী। তদুপরি, সাহায্য-সামগ্রী যেখানে আছে সেখান থেকে নিয়ে আসার ক্ষমতাও থাকতে হবে। ক্ষমতাবানও এমনি হওয়া চাই যে, ইশারা করার সাথে সাথে ওই জিনিস দৌড়ে হাযির হয়ে যাবে। সুতরাং তাঁর সমগ্র বিশ্বের সমস্ত সৃষ্টির উপর ক্ষমতাবান হওয়াও অপরিহার্য। সবকিছুর মালিক হওয়াও জরুরী। সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে জীবিত থাকাও আবশ্যক। যখন কারো এসব গুণ থাকবে, তখনই তিনি 'সবার জন্য রহমত' হতে পারবেন।

এখন আল্লাহ্‌র ঘোষণা দেখুন, "ওয়ামা---আরসালনা-কা ইল্লা- রাহমাতাল্লিল 'আ-লামী-ন।" (হে হাবীব! আমিতো আপনাকে প্রেরণ করিনি, কিন্তু (করেছি) সমস্ত বা সমগ্র বিশ্বের জন্য রহমত করেই।) সুতরাং যতক্ষণ পর্যন্ত বিশ্ব থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আপনিও মওজুদ থাকবেন। যখন রসূল ব্যতীত অন্য কিছু সৃষ্টিও করা হয়নি, তখন নূরে মুহাম্মদীকে সৃষ্টি করেছেন। অর্থাৎ বিশ্বে এমন কোন সময় অতিবাহিত হয়নি, যখন বিশ্ব আছে, কিন্তু 'রহমত' নেই। যদি রসূলে আক্‌রামের নূর মুবারকের সৃষ্টি বিশ্ব সৃষ্টির পরে হতো, তবে একটা মুহূর্ত বা সময় তো এমনও পাওয়া যেতো, যখন বিশ্ব ছিলো কিন্তু রহমত ছিলোনা। এমতাবস্থায়, প্রকৃত অর্থে রসূলে করীম 'রাহমাতুল্লিল আলামীন' হতেন না। কেননা, তখন বিশ্বের কোন সময়ে কোন কোন সৃষ্টিকে এ রহমতের গন্ডি থেকে বাইরে দেখা যেতো; কিন্তু মহান রব এটা মঞ্জুর করেন নি। তিনি সর্বপ্রথম 'বিশ্ব-রহমত'কে সৃষ্টি করেছেন, তারপর বিশ্ব সৃষ্টি করেছেন।

সুতরাং আয়াত শরীফটার তাফসীলী অনুবাদ বা মর্মার্থ দাঁড়াবে, 'হে মাহবূব! আমি আপনাকে সমগ্র বিশ্ব সম্পর্কে জ্ঞানী বানিয়ে প্রেরণ করেছি, সমগ্র বিশ্বে হাযির-নাযির করে পাঠিয়েছি, সমগ্র বিশ্বে মওজূদ করে প্রেরণ করেছি, সমগ্র বিশ্বের মালিক বানিয়ে পঠিয়েছি, সমগ্র বিশ্বের জন্য 'মুখতার' বানিয়ে প্রেরণ করেছি, সমগ্র বিশ্বে ক্ষমতা প্রয়োগকারী বানিয়েই প্রেরণ করেছি।' এখন যদি প্রশ্ন করা হয়-আল্লাহ্ তা'আলা কি একটি মাত্র সত্তার মধ্যে এসব গুণ বা বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি করতে পারেন? তখনতো জবাব আসবে অবশ্যই সৃষ্টি করতে পারেন। সুতরাং এখন কে আল্লাহকে এমনটি সৃষ্টি করতে বাধা দিতে পারে? এমনতো কেউ নেই। আলহামদুলিল্লাহ্।

র'উফ, রহীম ও রহমত

হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম মু'মিনদের জন্য রঊফ ও রহীম (দয়ার্দ্র ও দয়ালু) এবং সমগ্র বিশ্বের জন্য রহমত। রহমত আজব জিনিস। যদি হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর জন্য শুধু 'রাহীম' শব্দের ব্যবহার হতো, তাহলে মর্মার্থ অন্য কিছু দাঁড়াতো। কিন্তু হুযূর-ই আক্‌রাম শুধু রহীমই নন বরং রহমতও। রহমতও সমগ্র জাহানের জন্য। আর 'রহীম' থেকে রহমত কখনো পৃথক হতে পারে না। তাই নবী করীম সর্বত্র ও সর্বদা রহমত। এ রহমত দ্বারা শত্রু ও দোস্ত, প্রাণী ও জড় সবাই উপকৃত হয়েছে। হুযূর-ই আক্‌রাম নিজেই এরশাদ করেছেন- 'ইন্নামা--- আনা রহমাতুম্ মুহদাত'। (অর্থাৎ আমি ওই রহমত, যা আল্লাহ্ তা'আলা আপন মাখলূক্বদের জন্য তোহফা হিসেবে প্রেরণ করেছেন।)

আমাদের রসূলের রহমত হচ্ছে আম (ব্যাপক)। রসূলের রহমতের কথা মক্কার কাফিরদেরকে জিজ্ঞাসা করুন। আর ওই দৃশ্যকে স্মরণ করুন, যখন আমাদের আক্বা ও মাওলা বিজয়ী বেশে মক্কা মুকাররমায় প্রবেশ করেছিলেন। যে সম্প্রদায় হুযূর-ই আক্‌রাম ও সাহাবা-ই কেরামের উপর অকথ্য নির্যাতন করেছিলো, মক্কা মুকাররমাহ্ থেকে হিজরত করতে বাধ্য করেছিলো, মদীনা মুনাওয়ারায়ও এক সময় স্বস্থিতে থাকতে দেয়নি, তারা আজ পরাজিত ও অসহায় অবস্থায় নবী করীমের সামনে। হযরত খালিদ ইবনে ওয়ালীদের বীরত্ব আজ পূর্ণ জোশে রয়েছে। তিনি বলছিলেন, 'আল-ইয়াউমা ইয়াউমুল মালহামাহ্, আল-ইয়াউমা ইয়াউমুল মালহামাহ্' (আজ শত্রুদের রক্ত প্রবাহিত করার দিন, আজ প্রতিশোধ গ্রহণের দিন)। কিন্তু আমাদের আক্বা ও মাওলা তখনই ঘোষণা দিচ্ছিলেন-

'আল-ইয়াউমা ইয়াউমুল মারহামাহ্, আল-ইয়াউমা ইয়াউমুল মারহামাহ।' (আজ রহমত বা দয়া প্রদর্শনের দিন। আজ ইহসান ও ক্ষমা করার দিন।) বাস্তবিকই আমাদের আক্বা বিশ্ববাসীর জন্য রহমত। দুনিয়ার বাদশাহ্গণ কোথাও বিজয়ী বেশে গেলে সেখানে নিরাপত্তার ভূ-খন্ডকে ফিৎনা-ফ্যাসাদের ভূ-খন্ড করে দেয়; আর নবী করীমের রহমত দেখুন! তিনি ফিৎনা-ফ্যাসাদের ভূ-খন্ডকে নিরাপত্তার ভূ-খন্ডে পরিণত করে দিয়েছেন।

কবির ভাষায়-

کرم سب پر ہے کوئی ہو کہیں ہو - تم ایسے رحمۃ للعالمیں ہو

উচ্চারণ: করম সব পর হ্যায়, কূঈ হো, কাহেঁ হো-
তোম আয়সে রাহমাতুল্লিল 'আলামীঁ হো।

অর্থ: যে-ই হোক, যেখানেই থাকুক, সবার উপর আপনি সব সময় দয়া প্রদর্শন করেন- আপনি হলেন এমন রাহমাতুল্লিল 'আলামীন (সমস্ত বিশ্বের জন্য রহমত)।

একবার কাফিরদের জন্য যখন বদ-দো'আ করার নিমিত্তে দরখাস্ত করা হলো, তখন হুযূর-ই আক্রাম বলেছেন, ইন্নামা বু'ইস্তু রাহ্মাতান ওয়া লাম উব'আস আযা-বা-। অর্থাৎ আমাকে রহমত করেই প্রেরণ করা হয়েছে, আযাব করে আমি প্রেরিত হইনি।

রসূলে আক্রামের রহমত দেখতে চাইলে তায়েফের ময়দানে দেখো। এখানকার সম্প্রদায়টা এমন ছিলো যে, তারা রসূল-ই আক্রামকে বক্তব্য উপস্থাপন করতে দেয়নি, তাঁর উপর পাথর বর্ষণ করেছে। এক পর্যায়ে 'মালাকুল জিবাল' (পাহাড়গুলোর ফেরেশতা) হাযির হলেন আর আরয করলেন, "হে আল্লাহ্র রসূল, আপনি হুকুম দিন -এ সম্প্রদায়ের সাথে কিরূপ আচরণ করা যাবে? আপনি চাইলে এ দু'টি পাহাড়কে একত্রে মিলিত করে দেবো। আর এ সম্প্রদায় চিরদিনের জন্য ধ্বংস ও নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।" এমন সময় প্রতিশোধ গ্রহণের জযবাহ্ কতোই তুঙ্গে থাকে, তাতো বলার অপেক্ষা রাখেনা।

কিন্তু আমাদের আক্বা রসূলে আক্রাম বললেন, "আমি চাচ্ছিনা যে, তারা ধ্বংস হয়ে যাক এবং তাদের উপর হযরত নূহ্, হযরত লূত্ব (আলায়হিমাস্ সালাম)-এর সম্প্রদায় এবং মাদয়ান-সম্প্রদায়ের মতো শাস্তি এসে যাক। আমি তাদের উপর আযাব চাইনা, আমি চাই রহমত।" হুযূর-ই আক্রাম দো'আ করলেন, "হে মহান দাতা, তাদেরকে আযাব দিওনা, নাজাত দাও, হিদায়ত দাও, সেরাত্বে

মুস্তাক্বীম দাও, মুক্তি দাও।" দয়ালু রসূলের কতই প্রিয় ও দয়াপূর্ণ শব্দাবলী- "বাল্ আরজূ- আন্ আখ্রাজাল্লাহু মিন আসলা-বিহিম মাইঁ ইয়া'বুদুল্লা-হা ওয়াহ্দাহু লা-ইয়ুশ্রিকু বিহী শায়আ-।" অর্থাৎ "আমি চাচ্ছি আল্লাহ্ তা'আলা তাদের পৃষ্ঠদেশ থেকে এমন এক সম্প্রদায় বের করুন (এমন সব লোক জন্মগ্রহণ করুক), যারা এক খোদার ইবাদত করবে, তাঁর সাথে কাউকে শরীক করবে না।"

বিজ্ঞ আলিমগণ বলেন, রসূলে করীমের অন্তর্দৃষ্টি দেখছিলো যে, এরা ঈমান আনবে, তাদের পৃষ্ঠদেশে (ঔরশে) ঈমান আনবে এমন সন্তান-সন্ততিও রয়েছে, যারা এখনো জন্মগ্রহণ করেনি, যারা এখনো তাদের পিতৃপুরুষদের পৃষ্ঠদেশে রয়েছে। রসূলে আক্রাম তাদেরকেও বাঁচাচ্ছেন।

হুযূর-ই আক্রাম কখন থেকে রহমত?

'ইবনে ক্বাহত্বান' আপন কিতাব 'আল আহকাম'-এ হযরত ইমাম যায়নুল আবেদীন থেকে, তিনি আপন সম্মানিত পিতা হযরত সাইয়্যেদুনা ইমাম হোসাঈন থেকে তিনি আপন মহান পিতা হযরত সাইয়্যেদুনা আলী মুরতাদ্বা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম থেকে হুযূর-ই আক্রাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর এ পবিত্র ইরশাদ উদ্ধৃত করেছেন-

قَالَ كُنْتُ نُوْرًا بَيْنَ يَدَىْ رَبِّىْ قَبْلَ خَلْقِ اٰدَمَ بِاَرْبَعَةَ عَشَرَ اَلْفَ عَامٍ

অর্থ: তিনি এরশাদ করেন, আমি নূর ছিলাম হযরত আদম আলায়হিস্ সালাম-এর সৃষ্টির চৌদ্দ হাজার বছর পূর্বে আপন মহান রবের ক্বুদরতের সম্মুখে।

হুযূর-ই আক্রাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন- اَوَّلُ مَا خَلَقَ اللّٰهُ نُوْرِىْ(সর্বপ্রথম সৃষ্টি আমার নূরই)।

এভাবে আরো বহু সহীহ্ হাদীস শরীফ রয়েছে, যেগুলো থেকে প্রমাণিত হয় যে, হুযূর আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম-এর যাত মুবারক সৃষ্টি জগতে সর্বপ্রথম (সৃষ্টি); সুতরাং হুযূর-ই আক্রাম সৃষ্টির প্রথম থেকেই রহমত।

কার জন্য রহমত?

তিনি সমগ্র জাহানের জন্য রহমত। সমস্ত জগদ্বাসীর জন্য রহমত। হযরত ঈসা আলায়হিস্ সালাম সম্পর্কে এরশাদ হয়েছে- وَرَحْمَةً مِّنَّا (অর্থাৎ হযরত ঈসা আমার পক্ষ থেকে রহমত), কিন্তু কত দিনের জন্য, কার জন্য তা বলা হয়নি। নবীগণ সম্পর্কে এরশাদ হয়েছে- "আমি ততক্ষণ পর্যন্ত কোন সম্প্রদায় কিংবা দেশের উপর আযাব পাঠাইনা, যতক্ষণ না তার দিকে কোন রসূল পাঠাই।"

এ থেকে বুঝা গেলো যে, অন্যান্য নবীগণও মু'মিনদের জন্য রহমত তাঁদেরকে অমান্য করা আল্লাহর ক্রোধের কারণ হতো। দেখুন ফির'আউন ও তার সম্প্রদায় এবং হযরত লূত আলায়হিস্ সালাম-এর সম্প্রদায় প্রমুখের কী পরিনাম হয়েছে! হযরত নূহ্ আলায়হিস্ সালাম-এর উম্মতকে কীভাবে পানিতে ডুবিয়ে মারা হয়েছে! কিন্তু হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর জন্য এরশাদ হয়েছে, "আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে শাস্তি দেন না; কেননা, আপনি তাদের মধ্যে আছেন।" এমন ব্যাপক রহমত হচ্ছেন হুযূর-ই আক্রাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এরই।

হুযূর-ই আক্রাম কী পরিমাণ রহমত?

এ প্রশ্নের জবাবও لِّلْعٰلَمِيْنَ -এর মধ্যে রয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা 'রব্বুল আলামীন' আর হুযূর-ই আক্রাম হলেন 'রাহমাতুল্লিল 'আলামীন।' অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা যার রব, হুযূর-ই আক্রাম তার জন্য রহমত। 'আলম' বলা হয় আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত সবকিছুকে। তারপর এর অনেক প্রকার রয়েছে- সৃষ্টি জগৎ, নির্দেশ জগৎ, নূরী জগৎ, দেহজগৎ, ফেরেশতা জগৎ ইত্যাদি। আবার দেহ জগতে রয়েছে- মানব জগৎ, পশু জগৎ, তৃণ জগৎ, জড় জগৎ ইত্যাদি। এ 'আলামীন' শব্দ থেকে বুঝা যায় যে, হুযূর-ই আক্রাম প্রতিটি জগতের জন্য রহমত।

সমগ্র বিশ্ব হুযূর-ই আক্রামের মুখাপেক্ষী

হুযূর-ই আক্রাম সমগ্র জাহানকে আল্লাহর পক্ষ থেকে আপন রহমতের ফরয পৌঁছাচ্ছেন। আর প্রতিটি যুগে প্রতিটি যমানায় সমগ্র জাহান হুযূর-ই আক্রামের এ রহমতের মুহতাজ ও মুখাপেক্ষী। হুযূর-ই আক্রাম প্রত্যেক রহমতের মাধ্যম। হুযূর-ই আক্রামের কারণেই সমস্ত জগতের রহমত। কারণ, তিনি না হলে এ সবের কিছুই হতো না। এজন্যই আল্লাহ্ তা'আলা সমস্ত জগতকে রসূলে আকরামের দরবারে সালাত ও সালাম-এর নযরানা পেশ করার নির্দেশ দিয়েছেন।

হুযূর-ই আক্রাম সমস্ত নবীর জন্য রহমত

সমস্ত নবী আলায়হিমুস্ সালামও হুযূর-ই আক্রাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম থেকে রহমত পেয়েছেন। পূর্ববর্তী নবী ও রসূলগণকে উচ্চ মর্যাদাদি ও অধিক পরিমাণে মু'জিযাদি প্রদান করা, সমস্ত আসমানী কিতাব নাযিল করা-

এসবই আল্লাহ্ তা'আলার রহমত। যেগুলো হুযূর-ই আক্রাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর মাধ্যমে তাঁদেরকে দেওয়া হয়েছে। মানবজাতির পিতা হযরত আদম আলায়হিস্ সালাম সমস্ত সম্মান ও মর্যাদা পাওয়া হুযূর-ই আক্রামের ওসীলায়, তারপর তাঁর ত্রুটি-বিচ্যুতি (লাগ্যিশ) মাফ হওয়া হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এরই বরকতে, হযরত নূহ্ আলায়হিস্ সালাম-এর কিস্তী কিনারায় (স্থলভাগে) এসে লেগে যাওয়াও হুযূর-ই আক্রামেরই রহমতে, বরং হযরত ইব্রাহীম আলায়হিস্ সালাম-এর জন্য আগুন বাগানে পরিণত হওয়া, হযরত ইসমাঈল আলায়হিস্ সালাম-এর বিনিময় হিসেবে দুম্বা আসাও হুযূর আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম-এরই ওসীলায়।

হযরত জিব্রাঈল আলায়হিস্ সালাম-এর জন্য রহমত

তাফসীর-ই রূহুল বয়ানে এ আয়াতের ব্যাখ্যায় একটি হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে- একদা হুযূর-ই আক্রাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম হযরত জিব্রাঈল আলায়হিস্ সালামকে জিজ্ঞাসা করলেন- হে জিব্রাঈল, আমি তো 'রাহ্মাতুল্লিল 'আলামীন' (সমস্ত আলম বা জগতের জন্য রহমত), তুমিও তো এ 'আলম' (বিশ্ব)-এর মধ্যে রয়েছো। বলো তুমি আমার নিকট থেকে কি রহমত পেয়েছো? তিনি আরয করলেন, "হে আল্লাহর হাবীব! আমি সমস্ত নবী আলায়হিমুস্ সালাম-এর নিকট ওহী নিয়ে যেতাম; কিন্তু তখন পর্যন্ত আমার পরিণতি সম্পর্কে চিন্তামুক্ত ছিলাম না; অবশ্য আপনার কারণে আমি নিরাপত্তা পেয়ে গেছি; চিন্তামুক্ত হয়ে গেছি। আমি যখন থেকে আপনার উপর ওহী নিয়ে আসতে শুরু করলাম, তখন মহান রব আমার সম্পর্কে ক্বোরআন মজীদে এরশাদ করেছেন- "(জিব্রীল) শক্তিশালী, আরশ-অধিপতি আল্লাহর দরবারে সম্মানিত, সেখানে তার আদেশ পালন করা হয়, (সে) আমানতদার।"

[সূরা তাকভীর: আয়াত ২০-২১]

এ আয়াত শরীফ নাযিল হবার পর আমি আমার পরিণতি শুভ হবার উপর নিশ্চিত হয়েছি। আপনার মাধ্যমে আমি এ যে রহমত পেয়েছি তা আমার নিকট সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ।

মু'মিনদের জন্য রহমত

আল্লাহ্ তা'আলা আপন হাবীবকে ব্যাপক রহমত করেছেন। মু'মিনদের উপর হুযূর মোস্তফার রহমতের সীমা নেই। খোদ্ ক্বোরআন মজীদে এরশাদ হচ্ছে- "বিল মু'মিনীন-না রা'উ-ফুর রাহী-ম।" (মু'মিনদের প্রতি দর্য়াদ্র, দয়ালু)।

"আযী-যুন 'আলায়হি মা-'আনিত্তুম" (হে মু'মিনগণ, তোমাদের কষ্টে পড়া তাঁর নিকট কষ্টকর)। "কুন্‌তুম খায়রা উম্মাতিন" (তোমরা হলে শ্রেষ্ঠ উম্মত)। ক্বিয়ামতেও মু'মিনদের আলাদা শান- 'নূ-রুহুম ইয়াস্‌'আ বায়না আয়দী-হিম' (এ উম্মতের মু'মিনদের আগে ও ডানে-বামে নূর দৌঁড়াতে থাকবে।) সর্বপ্রথম এ-ই উম্মত আল্লাহর দীদার লাভ করে ধন্য হবে। সর্বপ্রথম তাঁরা জান্নাতে প্রবেশ করবেন। আর ফেরেশতাগণ তাঁদেরকে অভিভাদন জানাতে জানাতে মুবারকবাদের তোহফা পেশ করবেন।

কাফিরদের জন্য রহমত

হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর রহমত থেকে কাফিরগণও বঞ্চিত নয়। কাফিরগণও দুনিয়ায় সব ধরনের রহমত লাভ করছে। হুযূর-ই আক্‌রামের পূর্বেকার উম্মতগুলোর উপর তাদের কর্মের জন্য দুনিয়াতেই আল্লাহর আযাব এসে যেতো; দুনিয়াতেই গুনাহ্‌র জন্য তারা অপমানিত হয়ে যেতো। এমনকি এ দুনিয়াতেই তাদেরকে সমূলে ধ্বংস করে ফেলা হতো। 'আদ ও সামূদ গোত্র দু'টির পরিণতি এবং হযরত লূত আলায়হিস্‌ সালাম-এর সম্প্রদায়ের ধ্বংস এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ। হযরত নূহ আলায়হিস্‌ সালাম-এর উম্মতকে প্লাবনে ডুবিয়ে মারা হয়েছে, বনী ইসরাঈলের অপরাধীগণ শুয়র, বানর হয়ে গিয়ে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। আল্লাহ্‌ তা'আলা এরশাদ ফরমায়েছেন, "এমন অনেক বস্তি ছিলো, যেগুলোর বাসিন্দারা যালিম ছিলো। আমি তাদেরকে নিষ্পেষিত করে চুর্ণবিচুর্ণ করে ফেলেছি। আর তাদের পর অন্যান্য সম্প্রদায়কে তাদের স্থানে সৃষ্টি করেছি।" [সূরা আম্বিয়া]

কিন্তু 'রাহমাতুল্লিল 'আলামীন'- সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর রহমতের ঝলক দেখুন! মক্কার কাফিরগণ কত বড় বড় যুলুম-অত্যাচার করেছে; কিন্তু পরম করুণাময় তাদের বস্তিগুলোকে না উলট-পালট করেছেন, না তাদেরকে এ পৃথিবীতে পূববর্তী উম্মতগুলোর মতো আযাব (শাস্তি) দিয়েছেন; বরং এরশাদ করেছেন- "ওয়ামা কা-নাল্লাহু লিইয়ু'আয্‌যিবাহুম ওয়া আন্‌তা ফী-হিম।" [৮:৩৩] (অর্থাৎ এবং আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদেরকে শাস্তি দেন না, কেননা আপনি তাদের মধ্যে আছেন)। ক্বিয়ামতে ও হাশরের ময়দানে সবাইকে অসহনীয় অবস্থা থেকে নাজাত দান করাও হুযূর-ই আক্‌রামের মাধ্যমে হবে। প্রত্যেক সোমবার আবূ লাহাবের শাস্তিকে লঘু করা হয়- হুযূর-ই আক্‌রামের বেলাদত (মীলাদ) শরীফে খুশী হবার কারণে।

শরহে ক্বসীদা-ই বোর্দাহ্‌ খরপূতীতে বর্ণিত হয়েছে যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর শাফা'আত (সুপারিশ) সাত প্রকারের হবে। তন্মধ্যে তিন প্রকারের সুপারিশে কাফিরগণও উপকৃত হবে; বাকী চার প্রকারের সুপারিশ মুসলমানদের জন্য করা হবে; কিছু কিছু সুপারিশ গুনাহ্‌গারদের জন্য, আর কিছু সুপারিশ নেক্‌কার (সৎকর্মপরায়ণ) মুসলমানদের জন্য করা হবে।

গোলামদের জন্য রহমত

বিশেষত: আরবে এবং সাধারণত: সারা বিশ্বে দাস-দাসীদেরকে পশুর চেয়েও হীনতর মনে করা হতো। কিন্তু বিশ্বনবী রাহমাতুল্লিল 'আলামীন এরশাদ করেন- "হে লোকেরা, তোমাদের এ দাস-দাসীরা তোমাদের ভাইবোন, যাদেরকে আল্লাহ্‌ তা'আলা তোমাদের অধীনস্থ করেছেন। সুতরাং খবরদার, তোমরা তাদের অধিকারগুলোর প্রতি খেয়াল রেখো। তোমরা যা আহার করো, তা থেকে তাদেরকেও আহার করাও, যে পোষাক তোমরা নিজেরা পরিধান করো, ওই ধরনের পোষাক তাদেরকেও পরাও, তাদেরকে এমন কোন কাজের নির্দেশ দিওনা, যা তাদের সাধ্যের বাইরে। যদি তোমরা তাদেরকে এমন কোন কঠিন কাজের নির্দেশ দিয়ে থাকো, তাহলে তোমরা নিজেরাও তাদের সাহায্যে ওই কাজে লেগে যাও।" [বোখারী শরীফ]

হযরত যায়দ ইবনে হারিসাহ্‌ হুযূর-ই আক্‌রামের গোলাম ছিলেন। দীর্ঘদিন পর তাঁর পিতা হারিসাহ্‌ খবর পেয়ে হুযূর-ই আকরামের পবিত্র দরবারে এসে আরয করলো, "হুযূর, দয়া করে আমার পুত্র যায়দকে আমাকে ফিরিয়ে দিন। আপনি যত অর্থ (টাকা) চান আমি পরিশোধ করবো।" হুযূর-ই আক্‌রাম বললেন, "তোমার অর্থের আমার প্রয়োজন নেই। আমি যায়দকে ইখতিয়ার দিচ্ছি, সে যদি চায় তোমার সাথে চলে যেতে পারবে।" কিন্তু যায়দ হুযূর-ই আক্‌রামের নূরানী চেহারার দিকে দেখে এবং এতদিন তাঁর নিকট থেকে যেসব স্নেহ ও দয়া লাভ করেছেন সেগুলো স্মরণ করে যা বলেছেন, তা আ'লা হযরত মুজাদ্দিদে দ্বীন ও মিল্লাত কাব্যাকারে বর্ণনা করেছেন-

تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کا منھ کیا دیکھیں
کوں نظر وں میں جچے دیکھ کر تلوا تیرا
تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال
جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے ٹکڑا تیرا

উচ্চারণ: তেরে ক্বদমোঁ মে জো হ্যাঁয় গায়র কা মুঁহ্ কেয়া দেখেঁ,
কৌন নযরোঁ মে যাচে দেখ কর তালওয়া তা তেরা ।
তেরে টুকড়োঁ সে পালে গায়কী ঠো-কর পেহ্ নাহ্ ডাল,
ঝিড়কিয়াঁ খাঁয়ে কাহাঁ ছোড়কে টুকড়া তেরা ।।

অর্থ: আপনার কদম যুগলে যারা আছে, তারা অন্যের মুখ কি দেখবে?
আপনার কদম শরীফের তলদেশ দেখে কে সেটাকে যাচাই করতে পারে?
আপনার উচ্ছিষ্টের টুকরোগুলো দিয়ে পালন করুন, অন্য কারো পদাঘাত খাওয়ার জন্য নিক্ষেপ করবেন না; আপনার উচ্ছিষ্টের বরকতময় টুকরোগুলো ছেড়ে কোথায় গিয়ে তাড়া খাবো?

হযরত যায়দ পরিষ্কার ভাষায় তাঁর পিতাকে বলে দিলেন, ''আমি এ দয়ালু, স্নেহবৎসল আক্বা (মুনিব)-এর গোলামীর উপর হাজারো আযাদীকে উৎসর্গ করছি। হে আমার স্নেহবৎসল পিতা, আমি কোন অবস্থাতেই আমার এ মুনিবের চৌকাঠ ছাড়তে পারি না।'' তাঁর পিতা হারিসাহ্ তাঁর পুত্র যায়দের, রসূলে করীমের প্রতি অকৃত্রিম ভক্তি ও ভালবাসা দেখে খুশী মনে চলে গেলো। এরপর হুযূর-ই আক্রাম হযরত যায়দকে মুক্ত করে দিয়ে নিজের পালক-পুত্রের মর্যাদা দিলেন। সুতরাং হুযূর-ই আক্রামকে হযরত হোসাঈন ও হযরত যায়দের পুত্র উসামাকে আপন দু' স্কন্ধ মুবারকে বসিয়ে ভরপুর মজলিসে তাশরীফ নিয়ে আসতে দেখা গেছে। কবি শফীক্ব জৌনপুরী এ ঐতিহাসিক ঘটনাকে কাব্যে এভাবে ধারণ করেছেন-

جس جگہ ذکر فخر انام آتا ہے
جلی حرفوں میں اسامہ کا بھی نام آتا ہے
اک کندھے پہ ہے لخت جگر شیر خدا
دوسرے کندھے پہ فرزند غلام آتا ہے

উচ্চারণ: জিস জাগাহ্ তায্‌কিরাহ্-ই ফখরে আনাম আ-তা হ্যায়
জলী হরফোঁ মে উসামা কা ভী নাম আ-তা হ্যায়।
এক কান্ধে পেহ্ হ্যায় লখতে জিগরে শেরে খোদা,
দোসরে কান্ধে পেহ্ ফরযন্দে গোলাম আ-তা হ্যায়।

অর্থ: যেখানে গোটা সৃষ্টি জগতের গৌরব সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর আলোচনা আসে, ওখানে উজ্জ্বল অক্ষরে উসামা ইবনে যায়দের কথাও আলোচনায় আসে। তা হচ্ছে- এক কাঁধ মুবারকে হযরত শেরে খোদার

কলিজার টুকরা হযরত হোসাঈনকে তুলে নিয়েছেন, আরেক কাঁধ শরীফে নিজের গোলামের পুত্র (উসামা)কে তুলে নিয়েছেন।
এগুলো হলো গোলামদের প্রতি রাহমাতুল্লিল আলামীনের রহমত। এর মাধ্যমে তিনি উম্মতকে এ অনন্য শিক্ষা দিয়েছেন।

নারী ও শিশুদের প্রতি রহমত

বিশেষ করে আরবে এবং সাধারণভাবে গোটা বিশ্বে নারীদের কোন সামাজিক মর্যাদা ছিলোনা। নিষ্পাপ কন্যা-শিশুদেরকে জীবিত কবরস্থ করা হতো। কিন্তু রহমতে আলম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম রহমতের শিক্ষা দ্বারা এমন অভূতপূর্ব পরিবর্তন নিয়ে এসেছেন, যার ফলে নারীরাও পুরুষের মতো নিজেদের মর্যাদায় এসে দাঁড়িয়ে গেছে। নারীদের অধিকারগুলো ক্বিয়ামত পর্যন্তের জন্য সুদৃঢ় ও সংরক্ষিত হয়ে গেছে। আর জীবিত গোরস্থ করা হতো এমন শিশুরা সমগ্র দুনিয়ার দৃষ্টিতে স্নেহ ও ভালবাসার কেন্দ্রস্থল হয়ে গেছে। নারী ও শিশুদের প্রতি রহমত বা দয়ার অবস্থা তো এমনি যে, হুযূর-ই আক্রাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, ''কখনো আমি নামায শুরু করি, আর ইচ্ছা করি যে, নামাযটা দীর্ঘ করবো। কিন্তু যখন কোন শিশুর কান্নার আওয়াজ আমার কানে এসে যায়, তখন আমি নামাযকে সংক্ষিপ্ত করে ফেলি। (তখনকার দিনে নামাযে, যথানিয়মে মহিলারাও শামিল হতেন, যা এখন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে নিষিদ্ধ।) কেননা, শিশুর কান্না এবং তার ওই মায়ের অস্থিরতা, যে নামাযে শামিল হয়েছে- এ দু'-এর প্রতি আমার দয়া এসে যায়।''
[মুসলিম]

বৃদ্ধ ও দুর্বলদের প্রতি রহমত

বৃদ্ধ ও দুর্বলদের প্রতি হুযূর-ই আক্রামের রহমত বা দয়ার অবস্থা এযে, তিনি এরশাদ করেছেন, ''যদি বৃদ্ধদের বার্দ্ধক্য ও রোগাক্রান্তদের রোগের খেয়াল আমার না থাকতো, তবে আমি এশার নামাযকে রাতের এক তৃতীয়াংশ পর্যন্ত পিছিয়ে দিতাম।'' অনুরূপ, তিনি যখন ইসলামী সৈন্যবাহিনীকে রওনা করতেন, তখন অতি কঠোরভাবে হিদায়ত করতেন, ''খবরদার, গির্জা ও ইবাদতখানাগুলোর রাহিব (পুরোহিতগণ), বৃদ্ধ, নারী ও শিশুদেরকে কখনো হত্যা করবেনা। যুদ্ধে বিরোধী সিপাহীদের হত্যা করার পর তাদের ওষ্ঠ যুগল, নাক ও কান ইত্যাদি কর্তন করো না। দুর্বল ও রুগ্নদের সাথে অতি দয়া ও নম্রতার সাথে আচরণ করবে।'' সুবহা-নাল্লাহ্!!

পশু-প্রাণী ও গাছপালার প্রতি রহমত

রহমতে আলম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম শুধু মানবকুলের প্রতি দয়াপরবশ হবার নির্দেশ দেননি; বরং পশু-প্রাণী এবং গাছপালার প্রতিও তিনি এতবেশি দয়াপরবশ ছিলেন যে, আপন উম্মতকে সেগুলোর প্রতি দয়া করার নির্দেশ দিয়েছেন। এরশাদ ফরমায়েছেন- ''খবরদার, বাক্‌শক্তিহীন পশু-প্রাণীগুলোকে সেগুলোর ক্ষমতার বেশি বোঝা বহন করতে বাধ্য করো না। বিনাপ্রয়োজনে সেগুলোকে মারধর করো না। যদি একান্ত মারতেই হয়, তবে সেগুলোর চেহারার উপর মেরো না। সেগুলোর খাদ্য, চারা ও ঘাস ইত্যাদি দেওয়ার বেলায় কখনো কার্পণ্য করো না; কোন পশুকে ক্ষুধার্ত, পিপাসার্ত অবস্থায় যবেহ্ করো না, ভোঁতা ছুরি দিয়ে সেগুলোকে যবেহ করো না; বরং সেগুলো যবেহ করার সময় সব ধরনের নম্রতা প্রদর্শন করো।''

বাকী রইলো গাছপালার কথা। গাছপালা সম্পর্কে হুযূর-ই আক্‌রাম এরশাদ করেন, ''বিনা প্রয়োজনে সবুজ-সজীব গাছগুলো, বিশেষত: ফলমূল বিশিষ্ট গাছপালা কখনো কাটবে না। যেগুলো রাস্তার পাশে রয়েছে, মুসাফিরগণ যেগুলোর নিচে বসে বিশ্রাম নেয় সেগুলোও না।''

রহমত বা দয়া প্রদর্শনের শিক্ষা দান

হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর রহমতগুলো গণনা করে শেষ করা সম্ভবপর নয়। তিনি এরশাদ করেছেন, ''তোমরা যমীনে যারা আছে তাদেরকে দয়া করো, আসমানে যিনি আছেন তিনি তোমাদেরকে দয়া করবেন।'' অন্য হাদীসে তিনি এরশাদ করেছেন, ''যে ব্যক্তি মানুষের উপর দয়া করে না, তাকে আল্লাহ্ তা'আলা দয়া করেন না।'' [মিশকাত]

হুযূর কতদিন পর্যন্ত রহমত?

এর উত্তরও 'আল-আলামীন' শব্দটি বলে দিয়েছে। অর্থাৎ যতদিন, যতক্ষণ পর্যন্ত 'আলম' (বিশ্ব) থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত হুযূর-ই আক্‌রামের রহমত অব্যাহত থাকবে। অর্থাৎ এ দুনিয়ায় হুযূর-ই আকরামের রহমত, ক্বিয়ামতে, মীযানে, হাউযে কাউসারের নিকটে, জান্নাতে, এমনকি দোযখে গুনাহ্গার মু'মিনদের উপর হুযূর-ই আক্‌রামের রহমত থাকবে।

'তাফসীর-ই রূহুল বয়ান'-এ আছে, হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, ''আমার জীবদ্দশাও তোমাদের জন্য উত্তম এবং

আমার ওফাতও।'' সাহাবা-ই কেরাম আরয করলেন, ''হে আল্লাহর হাবীব! আপনার পবিত্র যিন্দেগী (জীবদ্দশা) তো উত্তম হওয়া সুস্পষ্ট, ওফাত শরীফ কীভাবে?'' হুযূর এরশাদ করলেন, ''আমার রওযা-ই আন্‌ওয়ারে প্রত্যেক জুমা ও সোমবার তোমাদের আমলগুলো পেশ করা হবে। তোমাদের নেক আমলগুলো দেখে আমি মহান রবের দরবারে শোকর আদায় করবো। আর মন্দ আমলগুলো দেখে তোমাদের জন্য মাগফিরাতের দো'আ করবো।'' হাদীস শরীফে হায়াতুন্নবী সম্পর্কে বর্ণনা এসেছে।

লক্ষ্যণীয় যে, কোন রহমত বা দয়াগ্রহিতা ততক্ষণ পর্যন্ত রহমত পেতে পারে, যতক্ষণ যাবৎ রহমতদাতা মওজুদ থাকেন। এ গোটা বিশ্ব এখনো পর্যন্ত মওজুদ রয়েছে এবং রহমত পাচ্ছে। সুতরাং প্রমাণিত হলো যে, এ বিশ্বকে রহমত বন্টনকারী হুযূর-ই আক্‌রাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামও নিশ্চিতভাবে জীবিত ও মওজূদ রয়েছেন।

হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম সৃষ্টিজগতের অস্তিত্বের 'মূল' হয়ে সর্বপ্রথম তাশরীফ এনেছেন। সমস্ত সৃষ্টি তাঁর (ওই মূলের) শাখা-প্রশাখা। এ কারণে 'নূর-ই মুহাম্মদী' (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)কে আল্লাহ্ তা'আলা সবার আগে সৃষ্টি করেছেন, অস্তিত্বে এনেছেন; তারপর যেভাবে শিখড় থেকে শাখা-প্রশাখা জন্মে, সেভাবে তিনি নূরে মুহাম্মদী থেকে সমগ্র জাহানকে সৃষ্টি করেছেন। যদি কোন গাছের শিখড় কেটে যায়, তবে সেটার শাখা-প্রশাখাগুলো তাৎক্ষণিকভাবে ফ্যাকাশে হয়ে যায়; তারপর নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। যদি হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্‌রামকে 'মৃত', 'মাটির সাথে বিলীন হয়ে গেছেন এমন' ইত্যাদি বলে মেনে নেওয়া হয়, না'ঊযুবিল্লাহ্, তা হলে তো মানতে হবে যে, গোটা বিশ্বের শিকড় কেটে গেছে। তখন সারা দুনিয়া কিভাবে স্থায়ী হতে পারে? আ'লা হযরত ক্বুদ্দিসা সির্‌রুল আযীয এ বিষয়কে এভাবে বর্ণনা করেছেন-

وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو
جاں ہیں وہ جہاں کی جاں ہے تو جہاں ہے

উচ্চারণ: উয়হ্ জো না থে তো কুছ না থা, উয়হ্ জো না হোঁ তো কুছ না হো,
জান হাঁয় উয়হ্ জাহান কী জান হ্যায় তো জাহান হ্যায়।

অর্থ: তিনি না হলে কিছুই হতো না, তিনি না থাকলে কিছুই থাকবে না।
তিনি হলেন গোটা জাহানের প্রাণ, সুতরাং তিনি থাকলে জাহান থাকবে।

আক্বীদা

আহলে সুন্নাতের আক্বীদা, সমস্ত হক্বপন্থীর বিশ্বাস ও এ মর্মে ঐকমত্য রয়েছে যে, নবীগণ আলায়হিমুস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম আপন আপন রওযা শরীফে সশরীরে জীবিত আছেন। তাঁদেরকে আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে রিয্ক্ব দেওয়া হয়, তাঁরা আপন আপন কবরে নামায পড়েন, তাঁরা নানা ধরনের নি'মাত উপভোগ করে থাকেন। তাঁরা দেখেন, শুনেন, কথা বলেন, সালাম নিবেদনকারীদের সালামের জবাব দেন। যেখানে চান আসা-যাওয়া করেন। আপন আপন উম্মতের আমলগুলো দেখেন। নানাভাবে ক্ষমতা প্রয়োগ করেন; ফুয়ূয ও বরকাত বিতরণ করেন। দুনিয়ায় অনেক সৌভাগ্যবানকে দিদার দান করে ধন্য করেন। আ'লা হযরত ক্বুদ্দিসা সিররুল আযীয বলেছেন-

ا. مدبیاء کو اجل آنی ہے - لیکن اتنی کہ فقط آنی ہے
پھر اسی آں کے بعد اں کی حیاب- مثل سابق وہی جسمانی ہے
روح تو سب کی ہے رندہ اں کا - جسم پر نور بھی روحانی ہے

উচ্চারণ: আম্বিয়া কো ভী আজল আ-নী হ্যায়,
লে-কিন এতনী কেহ্ ফক্বত্ব আ-নী হ্যায়।
ফের উসী আ-নকে বা'দ উনকী হায়াত,
মিসলে সাবেক্ব উয়হী জিসমানী হ্যায়;
রূহ তো সব কী হ্যায় যিন্দাহ্ উনকা
জিসমে পুরনূর ভী রূহানী হ্যায়।

অর্থ: ১. নবীগণেরও ওফাত হওয়া অবধারিত, কিন্তু এতটুকু যে, তা অতি ক্ষণস্থায়ী। ২. ওই সময়ের পরক্ষণ থেকে তাঁদের হায়াত পূর্বের ন্যায় ওই সশরীরেই। ৩. রূহ তো সবারই জীবিত, বিশেষত তাঁর নূরানী শরীরও রূহানী।

এ কারণে নবীগণ আলায়হিস্ সালাম-এর মুবারক শরীরগুলো তাঁদের কবর শরীফেও অবিকৃত থাকে। বর্ণিত আছে যে, হুযূর-ই আক্রাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, "তোমরা জুমার দিনে বেশি পরিমাণে দুরূদ শরীফ পড়ো। কারণ, তোমাদের দুরূদ শরীফ আমার সামনে পেশ করা হয়।" কোন সাহাবী আরয করলেন, "হে আল্লাহর রসূল, আমাদের দুরূদ শরীফ আপনার সামনে কীভাবে পেশ করা হবে? হয়তো কবর শরীফে আপনার শরীর মুবারক বিলীন হয়ে যাবে!" তদুত্তরে হুযূর-ই আক্রাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা

আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, "ইন্নাল্লা-হা হার্‌রামা 'আলাল আরদ্বি আন তা'কুলা আজসা-দাল আম্বিয়া-ই।" (মিশকাত শরীফ) অর্থাৎ নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা যমীনের উপর নবীগণের শরীরগুলোকে গ্রাস করা হারাম করে দিয়েছেন। অন্য বর্ণনায় এও আছে- "ফা নাবিয়্যুল্লা-হি হাইয়্যুন ইয়ুরযাক্ব" (সুতরাং আল্লাহর নবী জীবিত এবং তিনি রিযক্বও পান।) অন্য বর্ণনায় এসেছে- "আল আম্বিয়া-উ আহ্ইয়া-উন্ ফী ক্বুবূ-রিহিম ইয়ুসাল্লু-ন।" (নবীগণ তাঁদের কবরে জীবিত; তাঁরা তাতে নামায পড়েন।) আ'লা হযরত রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন-

تو رندہ ہے واللہ تورندہ ہے واللہ - مری چشم عالم سے چھپ جانے والے

উচ্চারণ: তু যিন্দাহ্ হ্যায় ওয়াল্লাহ্, তূ যিন্দাহ্ হ্যায় ওয়াল্লাহ্
মেরী চশমে 'আলম সে ছুপ জা-নে ওয়ালে!

অর্থ: আল্লাহরই শপথ, আপনি জীবিত, আল্লাহর-ই শপথ, আপনি জীবিত। ওহে আমার এ জাগতিক চক্ষুযুগল থেকে গোপন নবী। আলায়কাস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম!

পূর্বাপর সব কিছু সম্পর্কে জ্ঞাত

যিনি রহমত বা দয়া করেন, তাঁর জন্য একথা আবশ্যক যে, তিনি যাকে দয়া করবেন তার সম্পর্কে জানেন; অন্যথায় রহমত কিভাবে করবেন? সুতরাং এ আয়াত শরীফ দ্বারাই বুঝা যায় যে, হুযূর আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালামকে অনাদি (আযল) থেকে অনন্ত (আবাদ) পর্যন্ত সমস্ত সৃষ্টি সম্পর্কে জ্ঞান দান করা হয়েছে। কেননা, তিনি যদি সমগ্র বিশ্ব সম্পর্কে না জানেন, তাহলে সমগ্র জাহানের উপর দয়া কীভাবে করবেন? আল্লাহ্ তা'আলাও এরশাদ করেছেন, "ওয়া 'আল্লামাকা মা-লাম তাকুন তা'লাম। ওয়া কা-না ফাদ্বলুল্লা-হি আলায়কা আযী-মা-।" (অর্থাৎ হে মাহবূব! আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে ওইসব জিনিসের জ্ঞান দান করেছেন, যেগুলো সম্পর্কে আপনার জানা ছিলোনা। আর আল্লাহ্ তা'আলার অনুগ্রহ আপনার উপর খুব বড়।" সুতরাং এখন যে কেউই হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে 'রাহমাতুল্লিল 'আলামীন' মানবে, কিন্তু 'আলিমে মা-কানা- ওয়ামা-ইয়াকূ-নু' (পূর্বাপর সব কিছু সম্পর্কে জ্ঞাতা, আল্লাহর দানক্রমে) মানবে না, সে তারই মতো হবে, যে রোদ ও দিনের আলোকে স্বীকার করে; কিন্তু সূর্যের অস্তিত্বকে স্বীকার করে না।

রহমত ও সর্বোত্তম আদর্শ

আমাদের রসূল সমগ্র জগতের জন্য রহমত হয়েই তাশরীফ এনেছেন। আর সমগ্র বিশ্বকে আপন রহমতের দৌলত দ্বারা ধন্য করেছেন। তিনি নিজের অমূল্য শিক্ষা ও রহমতের সাথে সাথে তাঁর ব্যাপক রহমতের অগণিত কার্যত নমুনা এবং উদাহরণও দুনিয়ার সামনে পেশ করেছেন।

সুতরাং আমাদের একথা কখনো ভুলে যাওয়া উচিৎ হবে না যে, আমরা রাহমাতুল্লিল 'আলামীনের রহমতপূর্ণ দামনের সাথে সম্পৃক্ত আছি। সুতরাং আমাদের উপর একথা অপরিহার্য যে, আমরা যেন ওই পবিত্র দামনের মান-সম্মান রক্ষা করি, প্রতিটি সময় ও পদক্ষেপে আল্লাহর সৃষ্টির প্রতি দয়া প্রদর্শন করি এবং নিজেদের কর্মকান্ড দ্বারা দুনিয়াবাসীদের জানিয়ে দিই যে, আমরা রাহমাতুল্লিল 'আলামীনের গোলাম। আর যেন দুনিয়ার সামনে দয়া ও বদান্যতার এমন সব নমুনা পেশ করি, যা দেখে আমাদের শত্রুদের পাথরসম বক্ষগুলোও মোমের মতো গলে যায়।

এখন আমাদের চিন্তা করার সময় এসেছে যে, আমাদের রসূল-ই করীম তো গরীব, নিঃস্ব, এতিম, বিধবা ও প্রতিবেশীগণ, এমনকি পশু-পাখীগুলোর প্রতিও আপাদমস্তক শরীফ রহমত; কিন্তু আজ আমাদের আমল বা কর্মকান্ড কি? আমাদের ধনীরা যখন আপন আপন দস্তরখানাগুলোতে উন্নতমানের ও সুস্বাদু খাবার নিয়ে বসেন, তাঁরা কি রসূলে করীমের উম্মতের ক্ষুধার্ত, গরীব-মিসকীন, এতিম ও বিধবাদের কথাও স্মরণ করেন, যারা অনাহারে, অর্দ্ধাহারে দিনাতিপাত করছে? আমাদের অর্থশালীরা, শীতের মৌসুমে যখন নরম বিছানা ও গরম লেপ-তোষক ও কম্বলে সুখ ও আরামের বিছানায় শয়ন করেন, তখন কি তাঁরা এ মুসলিম জাতির ওই গরীব-মিসকীনদের কথা স্মরণ করেন, যাঁরা তাদের ঝুপড়ি কিংবা ফুটপাতগুলোতে ছেঁড়া-পুরানা চাদর মুড়ি দিয়ে কিংবা আরো মানবেতর অবস্থায় সারা রাত জাগ্রত থাকছে এবং একটু স্বস্তিতে ঘুমাতেও পারছেনা? যখন আমরা ঈদের দিনে আমাদের সন্তানদের গোসল করিয়ে ভাল ভাল কাপড় পরিয়ে তাদের আঙ্গুল ধরে সানন্দে ঈদগাহে যাই, তখন কি আমরা উম্মতে রসূলের ওইসব এতিম অসহায়দের কথাও স্মরণ করি, যাদের পিতা-মাতার ছায়া তাদের মাথার উপর থেকে উঠে গেছে? যারা ছেঁড়া ও আবর্জনাযুক্ত কাপড়ে বুক ভরা দুঃখ নিয়ে আমাদের মুখের দিকে চেয়ে থাকে? আর মনে মনে ভাবে- 'আহা, আজ যদি আমাদের পিতা-মাতা জীবিত থাকতেন, কিংবা তাদেরও সামর্থ্য থাকতো, তবে আজ আমরাও এভাবে ঈদগাহে গিয়ে আনন্দ উপভোগ করতাম।'

আমাদের নবীর দয়া ও উত্তম আদর্শের বর্ণনা দিয়ে কবি বলছেন-

جس کا بھری دنیا میں کوئی بھی نہیں والی

اس کو میرے آقا سینے سے لگاتے ہیں

উচ্চারণ: জিসকা ভরী দুনিয়া মে কূঈভী নেহী ওয়ালী,
উস্‌কো ভী মেরে আক্বা সীনে সে লাগাতে হ্যাঁয়।

অর্থ: গোটা দুনিয়ায় যার কোন অভিভাবক নেই, তাকেও আমার আক্বা (মুনিব) আপন বক্ষে জড়িয়ে ধরেন।

কিন্তু আমরা আমাদের রসূল রাহমাতুল্লিল আলামীনের উত্তম আদর্শ ছেড়ে বসেছি। সুতরাং কোন্ মুখে আমরা দাবী করতে পারি যে, আমরা মহান বিশ্ব রহমতের সত্যিকার অর্থে উম্মত? সুতরাং আমাদের মন ও মননে ইমানী ইনকিলাব পয়দা করা চাই। হুযূর-ই আক্‌রাম রাহমাতুল্লিল আলামীনের অকৃত্রিম ভালবাসাকে হৃদয়ে ধারণ করা চাই এবং তাঁর সাচ্চা আনুগত্য ও অনুকরণকে আমাদের জীবনের প্রধান লক্ষ্য করে নেওয়া চাই। তখনই আল্লাহর রহমত বা দয়া আমাদের ভাগ্যে জুটবে। আমরা আবারও বিশ্বমাঝে সগৌরবে দাঁড়াতে পারবো। কবি বলেন-

کرو مہربانی تم اہلِ زمیں پر

خدا مہرباں ہوگا عرش بریں پر

উচ্চারণ: করো মেহেরবাণী তোম আহলে যমীঁ পর,
খোদা মেহেরবাঁ হোগা আরশে বরীঁ পর।

অর্থ: তোমরা পৃথিবীবাসীর উপর দয়া করো, খোদা তা'আলা, মহান ও উচ্চ আরশের উপর তোমাদের প্রতি দয়াপরবশ হবেন।

আল্লাহ্ তা'আলা তাওফীক্ব দিন! আ-মী-ন।

আপনারা নিজেরাও চিন্তা করুন, যেসব ব্যক্তি ও যেসব জনগোষ্ঠী হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর দামন-ই রহমতকে আঁকড়ে ধরেছে, হুযূর-ই আক্‌রামের আনীত দ্বীনকে সত্য অন্তরে কবূল করেছে এবং হুযূর-ই আক্‌রামে প্রদত্ত জীবন-ব্যবস্থাকে নিজেদের কার্যত: জীবনে গ্রহণ করেছে, তারা কোথা থেকে কোথায় গিয়ে পৌঁছেছে! অনেকে তো গোমরাহ্ পথভ্রষ্ট ছিলো, কিন্তু এ আলোকিতকারী নূর থেকে হাসিল করার পর অন্ধকার গহীন গহ্বরে হিদায়তের প্রদীপ উজ্জ্বল করে দিয়েছে; মূর্খ ছিলো, কিন্তু এ জ্ঞান ও খোদা-পরিচিতির ফোয়ারা থেকে তৃপ্ত হওয়ার পর দুনিয়ার যে প্রান্তে গিয়েছে, ইল্‌ম ও হিকমত

(জ্ঞান ও প্রজ্ঞা)'র বাগান সুশোভিত করে দিয়েছে; গোয়াঁর ও অসভ্য ছিলো, কিন্তু পবিত্র তাহযীব ও তামাদ্দুন (সভ্যতা ও ধার্মিকতা)'র প্রতিষ্ঠাতা হয়ে গেছে। মোটকথা, আল্লাহ্ ও তাঁর হাবীবের রহমত দ্বারা তারাই ধন্য হয়েছে, যাঁরা হুযূর-ই আক্রাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর রিসালতের উপর ঈমান এনেছে এবং তাঁর আনীত দ্বীন-ই ইসলামকে মনে-প্রাণে কবূল করেছে।

বলাবাহুল্য, ওইসমস্ত তরীক্বত ও পীর-মুরর্শিদই সঠিক ও ফলপ্রসূ, যেগুলো ও যাঁদের হৃদয়ে রয়েছে আল্লাহ্ ও তাঁর হাবীবের প্রকৃত ভালবাসা। এ খোদা ও নবীপ্রেমের শিক্ষা ও দীক্ষা যথাযথভাবে দিতে পারেন তাঁরাই, যারা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আক্বীদায় বিশ্বাসী ও অনুসারী। কারণ, তাঁদের সম্পর্ক এ ধরনের কামিল মাশা-ইখের মাধ্যমে রাহমাতুল্লিল 'আলামীন সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে অটুট রয়েছে ও থাকে। এমন সহীহ্ তরীক্বতের সাথে যারা সম্পৃক্ত, তাঁদের মধ্যে আল্লাহ্ জাল্লা শানুহু ও রসুলে পাকের ভালবাসার উজ্জ্বল আলামতসমূহ পরিলক্ষিত হয়; যা অসুন্নী কিংবা নামসর্বস্ব সুন্নী সম্প্রদায়গুলোতে দেখা যায় না।

আমরা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় উদাহরণ হিসেবে এ ক্ষেত্রে পেশ করতে পারি শাহানশাহে সিরিকোট হুযূর ক্বেবলা সৈয়্যদ আহমদ শাহ্ সিরিকোটি, তাঁরই সুযোগ্য খলীফা ও উত্তরসূরী হুযূর ক্বেবলা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ সাহেব ক্বেবলা আলায়হিমার রাহমাহ্, তাঁরই সুযোগ্য খলীফা ও উত্তরসূরী হুযূর ক্বেবলা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তাহের শাহ্ সাহেব ও পীরে বাঙ্গাল হুযূর ক্বেবলা সৈয়্যদ মুহাম্মদ সাবির শাহ্ সাহেব ক্বেবলা এবং তাঁদের প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত 'আনজুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট এবং এর পরিচালনাধীন গাউসিয়া কমিটি, আনজুমান রিসার্চ সেন্টার এবং দ্বীনী মাদরাসারগুলোকে।

আনজুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট কর্তৃক পরিচালিত জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়াসহ শতাধিক মাদরাসা, জশনে জুলূসে ঈদে মিলাদুন্নবী, দাওরায়ে দাওয়াতে খায়র, মাসিক তরজুমানসহ প্রকাশনাগুলো ইত্যাদির কর্মসূচিগুলোতে এবং এ তরীক্বতের সাথে সম্পৃক্ত লক্ষ লক্ষ সুন্নী মুসলমানদের মধ্যে অকৃত্রিম খোদা ও নবীপ্রেমের প্রকৃষ্ট প্রমাণ পরিলক্ষিত হয়।

এভাবে সবাইকে আল্লাহ্ ও তাঁর প্রকৃত ভালবাসার উপর সুপ্রতিষ্ঠিত থাকার তৌফিক দিন! আমিন।

---সমাপ্ত---